প্রমীলা

গল্প সংকলন

সেকালের বিখ্যাত, একালের বিস্মৃতি
১০০ জন লেখিকার ১০০ টি গল্প

সম্পাদনা
বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

ভূমিকা		১১
মুকুল	নগেন্দ্রবালা দাসী	৩১
শরৎকুমার	স্বর্ণকুমারী দেবী	৩৭
আদরের, না অনাদরের?	শরৎকুমারী চৌধুরাণী	৪৪
অদৃষ্ট চক্র	মানকুমারী বসু	৫২
আত্মোৎসর্গ	সুশীলা সেন	৫৯
নীলাম	হিরন্ময়ী দেবী	৬৪
মনের অগোচরে	হিরন্ময়ী বসু	৬৮
মালতীর মালা	সরলা দেবী	৭৯
ঘড়ি-চুরি	সরলাবালা দাসী	৮২
মাতৃহীনা	ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	৮৮
পিঞ্জরের বাহিরে	সত্যবাণী গুপ্ত	৯৫
সেকালের রোমান্স	সরলাবালা সরকার	১০৪
পূজার-ছুটি	সরোজকুমারী দেবী	১১০
পুরস্কার	ইন্দিরা দেবী	১২১
বিয়ে-পাগলা বুড়ো	বেগম রোকেয়া	১২৫
মা	অনুরূপা দেবী	১২৯
লতা	উর্ম্মিলা দেবী	১৩৫
স্নেহের সার্জারী	নিরুপমা দেবী	১৪৮
জননী	উষা রায়	১৫৯
সুরো	মাধুরীলতা দেবী	১৬৫
নিয়তি	কাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭২
যাত্রা-সঙ্গী	গিরিবালা দেবী	১৭৬
একটা প্রকাণ্ড 'হাঁ'	জ্যোতির্ময়ী দেবী	১৮২
পিতৃদায়	শান্তা দেবী	১৯১
সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান	শৈলবালা ঘোষজায়া	২০৬
মা	বিহঙ্গবালা দাসী	২১৩
স্মৃতিরক্ষা	সীতা দেবী	২২৯
পরাজয়	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	২৪৩
বিমাতা	অপর্ণা দেবী	২৫৭
যাত্রী	নীহারবালা দেবী	২৬১

অনাদৃতা	অমিয়া চৌধুরী	২৬৮
মহালয়ার উপহার	লীলা মজুমদার	২৮১
তাসের ঘর	আশাপূর্ণা দেবী	২৮৪
পাশের ঘর	আশালতা সিংহ	২৯০
বনান্তরাল	হাসিরাশি দেবী	২৯৮
কিউ	শান্তি দেবী	৩০৫
দুকূলহারা	প্রতিভা বসু	৩০৯
জতুগৃহ	সুলেখা দাশগুপ্ত	৩১৮
কোনও এক মলি দত্ত	বাণী রায়	৩২৪
অন্তঃসলিলা	সাবিত্রী রায়	৩৩২
গানা বেগানা	গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৮
ফুল-দোল	শৈলজা মুখোপাধ্যায়	৩৪২
পুরনো গন্ধ	তৃপ্তি মিত্র	৩৫২
অনুভব	রানু ভৌমিক	৩৫৮
এজাহার	মহাশ্বেতা দেবী	৩৬৫
উত্তরঙ্গ	মায়া বসু	৩৮৯
ঘেন্না	সুলেখা সান্যাল	৩৯৭
নোনা সাগরের কান্নায়	মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত	৪০৬
চিত	কবিতা সিংহ	৪১৮
'মা' কে	বীণা মজুমদার	৪২৬
প্রথম বধ্যভূমি	রাবেয়া খাতুন	৪৪০
বনবুড়ি	কল্যাণী বসু	৪৪৬
মেজকাকিমার গল্প	নবনীতা দেবসেন	৪৫৩
মুক্তি	বাণী বসু	৪৬০
অনন্য পৃথিবী	রিজিয়া রহমান	৪৬৭
জনারণ্যে একা	কণা বসু মিশ্র	৪৭৬
অরণ্যের থাবা	শ্যামলী গুপ্ত	৪৮৪
দাদআলীর কলজে	সেলিনা হোসেন	৪৮৯
শব্দভেদ	নন্দিতা বাগচী	৪৯৬
যুধিষ্ঠিরের বোন	পূরবী বসু	৫০২
ঘৃণার সমস্যা	জয়া মিত্র	৫০৭
পরখ, পরিক্রমায়	জ্যোৎস্না কর্মকার	৫১৫
উজানবেলা	সুচিত্রা ভট্টাচার্য	৫২১
স্নেহলতা	মীনাক্ষী সেন	৫২৮
জায়গা বদল	সীমা রায়	৫৪৫
ফুলপিসি, তোমাকে	চন্দ্রা ঘোষ মিত্র	৫৫২

নিরুদ্দেশ যাত্রা	অনিতা অগ্নিহোত্রী	৫৬১
মালবিকা সাগরিকা	ঋতা বসু	৫৭২
মাফলারে ঢাকা	চিত্রালী ভট্টাচার্য	৫৮২
যামিনীর জপতপ	তৃপ্তি সান্ত্রা	৫৮৭
শিকার	সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯৩
এক প্রজাপতি ও বৃক্ষলতা	অঞ্জলি দাশ	৬০৩
লজ্জা	জাহান আরা সিদ্দিকী	৬১৫
আবাদ	কৃষ্ণা রায়	৬২০
বৃক্ষছায়া	বিজয়া দেব	৬২৮
লাল পাখির নীল চোখ আঁখি	দীপ্তি দেব	৬৩২
জল খাবেন বনদুর্গা	ঝুমুর পাণ্ডে	৬৩৭
পরমশত্রু	হেনা ইসলাম	৬৪৩
ইস্কুলবেলা	অপরাজিতা ঘোষ	৬৪৭
দেশবাড়ি	শর্মিলা দত্ত	৬৫৪
ছায়া সংসর্গে	তিলোত্তমা মজুমদার	৬৫৯
কস্তুরীমৃগ	কাবেরী রায়চৌধুরী	৬৬৮
চোরাটান	অহনা বিশ্বাস	৬৮৩
বিষজমি	অনিন্দিতা গোস্বামী	৬৯৩
মুদ্রার ভিন্ন পিঠ	দোলনচাঁপা দাস পাল	৭০১
তৃতীয় অধ্যায়	জয়িতা চাকলাদার	৭০৫
পরিণত	সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১৫
ন্যাড়া	অমলা দেবী	৭৩১
সমুদ্রসাক্ষী	অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়	৭৬২
অবগুণ্ঠনবতী	উর্মিলা গুপ্তা	৭৭২
পাখির বাসা	গোপা সেন	৭৭৭
মানুষের মতো মানুষ	জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়	৭৮২
মানিপ্ল্যান্ট	জয়শ্রী সেন	৭৮৫
সীতাহরণ পালা	তন্বী হালদার	৭৯৪
নাকফুল	তিতাস চৌধুরী	৭৯৮
নীড়ভ্রষ্ট	পুষ্পলতা দেবী	৮০৪
বসুধা	বনানী দাস	৮১২
উত্তরাধিকার	বেলা মুখোপাধ্যায়	৮২০
বোধ	সোনালি চক্রবর্তী	৮২৬
ফতেমা	সৌতি মিত্র	৮৩৪

ভূমিকা

মানুষ জন্মেছেন কবে জানি না! তবে এটা জানি, মানব সন্তান কথা বলতে শেখা-মাত্র, মানে মা, বাবা শব্দ উচ্চারণের পরবর্তী পর্যায়েই বলেছে,– গল্প বলো, গল্প শুনি। তার সে শুনতে চাওয়া তো মা-ঠাকুমা-দিদিমার কাছেই। তাঁরাই প্রথম গল্পের জন্মদাত্রী। কথাকোবিদ। শিশু-সন্তানের আবদার মেটাতে প্রথম মুখে মুখে গল্প বানানো শুরু করেছিলেন তাঁরাই।

সবকিছুরই সূচনারও আগে একটা আরম্ভ থাকে। রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপারটাকে বলতেন : 'প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানো।' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটোগল্পের প্রদীপটি জ্বলার আগেও তার সলতে পাকানোর কাজ করে গেছেন অনেকেই। বিশেষ করে, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, জলধর সেন এবং অতি-অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। স্বর্ণকুমারী দেবীই বাংলা ভাষায় প্রথম মহিলা গল্পকার।

গল্প : গল্প আমাদের বড়ো আদরের জিনিস। গর্বের ধন। সে কী আজকের কথা! মানবজন্ম থেকেই গল্পেরও জন্ম। মানুষ কথা বলতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শিখেছে গল্প বলতে পারাও। গল্প শব্দটি এসেছে 'জল্প' বা 'জল্পন' বা 'জল্পনা' থেকে। আর জল্পনা হল মানুষের কথাবার্তা। এর মধ্যে আমরা সহজেই মানুষের কল্পনা-প্রবণ মনের সন্ধান করতে পারি। আসলে মানুষ তার অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে গিয়ে তাকে কল্পনার নানা রঙে রাঙিয়ে মনোহারী করে তুলত। গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি। মানুষের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন গল্প বলার ইতিহাস। যাযাবর মানুষের মনে একদিন প্রথম দেখা দিয়েছিল কথার অঙ্কুর। সেই কথাকে তারা প্রথম রূপ দিয়েছিল ভাষার মধ্যে। মানুষের গল্প বলার/শোনার আকাঙ্ক্ষা সেই আদিম কালের।

গল্পের উৎস : গল্পের উৎসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় পুরাকাহিনি। রূপকথা। আর, উপকথার কথা। হোমারকে বলা হয় প্রতীচ্য গল্প-সাহিত্যের পথ-নির্দেশক। এছাড়া তো আছেই আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের গল্প। সে-সব গল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে 'ঋগ্বেদে'। 'জাতকে'। 'রামায়ণে'। 'মহাভারতে'। 'পঞ্চতন্ত্রে'। আর গল্প আছে আরব্য-পারস্য উপন্যাসে।

কালিদাসের 'রঘুবংশম্'-কে তো একটা গল্প-ভাণ্ডারই বলা চলে। এছাড়া 'হিতোপদেশ', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কথাসরিৎসাগর', 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী', 'দশকুমার চরিত', 'হর্ষচরিত', 'কাদম্বরী', 'বাসবদত্তা' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ভারতের 'কথাসরিৎসাগর' সমগ্র পৃথিবীকেই ব্যাপ্ত করেছিল। গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ থেকেই গল্পের ধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ তা এক বিশ্ব-কথাসরিৎসাগরে পরিণত হয়।

আদি গল্প : 'গোপীচাঁদের গীত', 'মনসার ভাসান', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শীতলা মঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রভৃতি পাঁচালি বা গাথাগুলিকেও বাংলা সাহিত্যের আদি-গল্প রূপে ধরা যেতে পারে।

মানুষের নন্দন সাধনায় গল্প রচনা ও গল্পের বাসনা দিনে দিনে একাগ্র হয়েছে। আজও গল্প-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ এখনও গল্পের জাদুতে মুগ্ধ।

সেই কতকাল আগে কোন্ মহাজন কথাকে বৃহৎ করে লিখেছিলেন 'বৃহৎ-কথা'। আর কথা-সরিতের সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন যিনি বা যাঁরা, তাঁরা তো আজ ইতিহাস। এগুলোই আমাদের বাংলা গল্পের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। জন্তু-জানোয়ার-পক্ষীকেও যাঁরা নায়ক বা কথকের মর্যাদা দিয়ে গল্প শুনিয়ে গেছেন, সেই সাহসী আদি গল্পকারগণ আমাদের প্রণম্যজন। বহুকাল আগে 'পঞ্চতন্ত্র' আর 'হিতোপদেশ'-এও তো কম মহান গল্প শোনানো হয় নি। তারও পর কত-শত শতক পার হয়ে গেল চর্যা আর পদ্যের প্রবহমানতায়। সেই বয়ে চলা স্রোতোধারায় ক্রমশ একের পর এক এসে গেল গদ্য। গদ্য-সাহিত্য। আদি-গল্প। গল্প। ছোটোগল্প।

গদ্য : বাংলা গদ্যের সূচনা ও ক্রমবিকাশে সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিশিষ্ট অবদানের কথা বলতেই হয়। তবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এও উল্লেখ্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০) দুশো বছর আগেও বাঙালি সমাজে গদ্যরীতির প্রচলন ছিল।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, আবেদন-পত্র, মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক লেখাপত্র ও অন্যান্য দু'চারটি ছোটোখাটো বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া গেছে। যদিও সে-সব ছিল নিতান্তই কাজকর্মের ভাষা। বলাবাহুল্য, সেই কেজো গদ্যভাষা আদৌ শিল্পের ভাষা নয়। তা গদ্য মাত্র। গদ্যসাহিত্যও কখনোই নয়।

দোম আন্তোনিও (আন্তোনিয়ো) দো রোজারিয়ো (রোজারিও) রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটি ১৭২৬-এর পূর্বেই রচিত বলে অনুমিত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' শিরোনাম দিয়ে এটি প্রকাশ করেন। এটি নিছক একটি ধর্মপুস্তিকা।

১৭৩৫-এ রচিত হয় পর্তুগীজ পাদরি মানোএল (মানোয়েল)-দা-আস্‌সুম্পসাঁও-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এটিও প্রশ্নোত্তর ঢঙে লেখা একটি ধর্ম-পুস্তিকা মাত্র।

এভাবে ক্রমশ বাংলা গদ্য পুঁথি থেকে মুদ্রণের যুগে আসতে থাকে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই কলেজের অবদান বিস্ময়কর।

গদ্য গ্রন্থ : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুনশিরাই প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইংলন্ড থেকে নবাগত কিশোর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও ইতিহাস শেখাবার জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এই কলেজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লির নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কেরী সাহেব এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বাংলা গদ্য-গ্রন্থের মুদ্রণ ও ক্রমবিকাশে এই বিদেশি মানুষটির অবদান প্রতিক্ষণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১৭৬১-র ১৭ আগস্ট নরদামটন-শায়ারের পলাস-পিউরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কেরী। ধার্মিক পিতার ধার্মিক পুত্র। ধর্মপ্রচারের জন্য সপরিবারে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন। ১৭৯৩-এর ১১ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছে ধর্মপ্রাণ ডাক্তার জন

টমাসের বাংলার শিক্ষক রামরাম বসুকে কেরী তাঁর মুনশি নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের বিনিময়ে কেরীকে বাংলা শেখাবার জন্য নিয়োজিত হন রামরাম বসু।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের ভার পান উইলিয়ম কেরী। সেই ভার গ্রহণের পর তিনি বিভাগীয় সুপরিচালনার অভিপ্রায়ে কয়েকজন পণ্ডিত-মুনশির নিয়োগ সুপারিশ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু। রামরাম এই কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপকরূপে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। কেরী যাঁদের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)।

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) রচিত 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থ দুটির শেষোক্ত গ্রন্থটির মধ্যে ('ইতিহাসমালা') বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গল্পরসের সন্ধান পাই। 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'ইতিহাসমালা'-র গল্পগুলির উৎস লোককথা হতেও পারে। তবু এই আখ্যান বা গল্পগুলির মধ্যে কেরীর উর্বর কল্পনা, মৌলিক ভাবনা ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে নিশ্চয়ই। 'ইতিহাসমালা'-য় কেরীর গল্পগুলি পড়লেই এ-কথার সত্যতা মিলবে। গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। কখনও-কখনও চমৎকার কৌতুকরস পরিবেশনে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কেরী। তাঁর রচনা ভঙ্গিমাও চিত্তাকর্ষক। সরল গল্প-আখ্যান পাঠককে আনন্দ দেয়।

বাংলা গদ্যরীতির সাধু প্রকরণটি যে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল, তা ১৮১২-তে কেরীর রচিত 'ইতিহাসমালা' থেকেই বেশ টের পাওয়া যায়। এখানে কিছু কিছু গল্পে চমৎকার সরস রঙ্গ-কৌতুকের উদার প্রকাশ ঘটেছে। এজন্য কেরী, সেই-কালের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে এ-কালেও নিশ্চয়ই সকলের উচ্চপ্রশংসাই পাবেন।

কেরীর নির্দেশেই তাঁর পূর্বে অবশ্য দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২)। এ-কথা সত্য, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা অক্ষরে ছাপা বাঙালির রচিত প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু নীরস, তথ্যসর্বস্ব এই রচনায় গল্প-রসের কোনো অবকাশই ছিল না। তাছাড়া প্রথম মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থের রচনাকার হলেও গদ্য সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়।

সে কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)। ইনি লেখেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩-তে রচিত, ১৮৩৩-এ মুদ্রিত)।

গদ্য সাহিত্য : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কলমে ছিল বিশেষ প্রতিভার স্পর্শ। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা গদ্য গদ্য-সাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রথম। মৃত্যুঞ্জয়ই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই একমাত্র ভাষা-সচেতন শিল্পী। তাঁর রচিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র একাধিক আখ্যান উৎকৃষ্ট গল্প হয়ে উঠেছে। ভাষার মাধুর্যে, হাস্যরস সৃষ্টিতে, ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছটায়, সর্বোপরি গল্প-রস পরিবেশনের কৃতিত্বে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র একাধিক আখ্যান বা গল্প সে-যুগের পক্ষে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যেই প্রথম ভাষার প্রসন্নতা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, সর্বোপরি গল্প-রস পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) রচনায় গল্প-রস ব্যাপারটা কল্পনাতেও আসে না। আসলে তিনি যুক্তির অস্ত্র ধারণ করে নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্য রচনার সময় তাঁর ছিল না। তাঁর ভাষায় তার্কিকতাই প্রধান। পরমত খণ্ডন ও নিজমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র অভিপ্রায়ে তাঁর গদ্য হয়েছে শাণিত অস্ত্র। সাময়িক প্রয়োজনের জন্য লেখালেখি হওয়ায়

সেখানে রম্য-সাহিত্য রস সৃষ্টির কোনো অবকাশই ছিল না। রামমোহন রায় ছিলেন প্রধানত যোদ্ধা। শিল্পী নন। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, তাঁর গদ্যেই বাঙালির প্রথম মানসমুক্তি ঘটেছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) লেখালেখির প্রধান ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সমাজের হিতসাধন। তবু তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনার মানসে আখ্যানধর্মী নকসা লেখেন। সেই রচনাগুলিতেও আমরা যথেষ্ট গল্পরসের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি সামাজিক গল্প।

যেমন অসংখ্য ছোটো ছোটো আখ্যানধর্মী সামাজিক গল্পের ফুল দিয়ে একটি অখণ্ড মালা গেঁথেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ।

বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সকল কর্মেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর গভীর সমাজসচেতনতা-বোধ। তাঁর গ্রন্থাবলি রচনার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে সত্য। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর 'আখ্যানমঞ্জরী'-তেও এই সমাজ-সচেতনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) রচনাতেও আমরা পেয়েছি কাহিনিধর্মী গল্প-রস।

ছোটোগল্পের পূর্বাভাস : গল্প : আধুনিক বাংলা ছোটোগল্প একান্তই উনিশ শতকের দান। এই শতাব্দীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সমসাময়িক কালে গল্প লিখেছেন। তবে যথার্থ অর্থে আধুনিক ছোটোগল্প বলতে যা বুঝি তা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এনেছেন রবীন্দ্রনাথই।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটোগল্পের কিছুটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে শ্রী পূঃ চঃ রচিত 'মধুমতী' গল্পে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ মাসে (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) গল্পটি প্রকাশিত (১৮৭৩/১২৮০) হয়। ইনি ছিলেন বঙ্কিম-সহোদর শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য 'মধুমতী' যথার্থ অর্থে ছোটোগল্প হয়ে ওঠেনি। 'বঙ্গদর্শন'-এ রচনাটিকে 'উপন্যাস' নামে পরিচিত করা হয়েছে। মূল গল্পাংশে বঙ্কিমের বিভিন্ন কাহিনির প্রভাব অনায়াসে চোখে পড়ে। বিন্যাস ও ভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

অবশ্য কারও কারও মতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটোগল্পের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) 'ভ্রমর' পত্রিকায় (১২৮১/১৮৭৪) প্রকাশিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' নামের গল্প দুটিতে। কিন্তু এ দুটিও ঠিক ছোটোগল্প নয়। 'নভেল' শ্রেণির রচনা। এর মধ্যে অবশ্য 'দামিনী' গল্পটিতে ছোটোগল্পের কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। তবুও এগুলিকে ঠিক ছোটোগল্প না বলে, ছোটোগল্পের পূর্বাভাস বললেই যথার্থ বলা হয়।

ছোটোগল্পের আবির্ভাব : বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের আবির্ভাব নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনা। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান করলে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই গল্প পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবে 'ছোটোগল্প' নামক একটি বিশিষ্ট রূপ-সৃষ্টি শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। তাই ছোটোগল্প একেবারেই আধুনিক যুগের সন্তান। প্রাগাধুনিক যুগে আধুনিক ছোটোগল্পের পূর্বপুরুষ সন্ধান নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। আসলে প্রশ্নমুখর আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন না হলে ছোটোগল্পের জন্ম হতে পারে না। তাই, ছোটোগল্পের জন্ম একেবারে আধুনিক যুগে। শিল্পবিপ্লবের পর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

ছোটোগল্পের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ক্রম-অগ্রসরমান জীবনধারায়। ছোটোগল্পের ইতিহাসগত সূচনা হল উত্তর আমেরিকায়, ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপভ্যান উইঙ্কল', এডগার অ্যালান পো-র 'ম্যানুসক্রিপ্ট বাউন্ড ইন এ বটল', আর নাথানিয়েল হথর্ন-এর 'সিলেশ্চিয়েস ওমনিবাস'-এ।

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ছোটোগল্পের জন্ম পুরোনো পৃথিবীতে (ইউরোপে) হয়নি। হয়েছে নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকায়)।

একসময় জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলি পারিপার্শ্বিকের চাপে ধসে পড়ে। প্রকাশব্যাকুল ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজচেতনার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সংস্কারকে দেবতাজ্ঞানে আর ভক্তি করতে চায় না। এমন সময়েই বুঝি ব্যক্তির হৃদয় থেকে ধ্বনিত হয় আত্মজিজ্ঞাসা।

ছোটোগল্পের জন্ম এই লগ্নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-আমেরিকায় দেখা দিয়েছিল এই সংঘর্ষ। মুক্তি-ব্যাকুলতা। আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সমাজ-সচেতনতা। এই সময়ে ফ্রান্সে, উত্তর আমেরিকায়, রাশিয়ায়, ভারতে দেখা দিলেন ছোটোগল্পের প্রথম পাঁচ প্রবর্তক। গী দ্য মোপাসাঁ। এডগার অ্যালন পো। নাথানিয়েল হথর্ন। নিকোলাই গোগোল। এবং রবীন্দ্রনাথ।

ছোটোগল্পের সংজ্ঞা : ছোটোগল্পের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ কঠিন। আজ পর্যন্ত ছোটোগল্পের কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হয়নি। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, ছোটোগল্প কত বিচিত্র-রকমের হতে পারে।

সব গল্পই ছোটোগল্প নয়। এমনকি আকারে ছোটো হলেও সে গল্প অনেক সময় ছোটোগল্প নাও হতে পারে। ছোটোগল্পের চরিত্র-সংখ্যা কম। ঘটনাও কম। পরিশেষে কোনো একটি প্রধান ঘটনা বা চরিত্র বা ভাব প্রাধান্য লাভ করে এখানে।

ছোটোগল্প জীবনের ফলবান খণ্ড মুহূর্তের রূপায়ণ। সেই সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসাও বটে। ছোটোগল্পের গঠন-কৌশল বিষয়ে সবচেয়ে জরুরি হল, একাগ্র-কল্পনা-সংহতি। উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতির একমুখিতা। ছোটোগল্প প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত, 'ছোটোগল্প বলবারও একটা আর্ট আছে এবং আমার বিশ্বাস এ আর্ট নভেল লেখার আর্টের চাইতেও কঠিন.....আর্টে কনটেন্টের মূল্যের চাইতে ফর্ম-এর মূল্য ঢের বেশি।'

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে,'.....আধুনিক ছোটোগল্প হল যন্ত্রণার ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে—অন্তত। মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু শূন্যতার আঘাতে তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে....। ছোটোগল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বেরই এক একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোটোগল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তারাই তাঁর রচনায় ধরা দেবে। ছোটোগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বেরই বিচিত্র-রঞ্জিত বিকাশ।'

ছোটোগল্প শিল্পীর অনুভূতিপ্রসূত এমন এক বাধাবন্ধনযুক্ত গদ্য কাহিনি, যার সুনির্দিষ্ট ও একমুখী বক্তব্য কোনো ঘটনা, পরিবেশ বা মানসিকতাকে আশ্রয় করে দ্বন্দ্ব ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

ছোটোগল্প এমনই এক গদ্যকাহিনি, যার স্বল্প পরিসরে গল্পটির চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতিকে বা চরম পরিণতিতে গল্পকার শৈল্পিক কুশলতায় উচ্চতর কোটিতে পৌঁছে দেন। ঘটনা, চরিত্র, অনুভূতি, সাংকেতিকতা যাই ছোটোগল্পের বিষয়ীভূত হোক না কেন, তা গল্পকারের পরিমিতিবোধ, আকস্মিক সূচনা, পরিশেষে রসের নিবিড় মোচড় বা চমৎকারিত্বের গুণে সার্থক হয়ে ওঠে।

ইংরেজ গল্পলেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন প্লট-প্রধান, চরিত্র-প্রধান ও ইম্প্রেশন-মুখ্য এই তিন শ্রেণির ছোটোগল্পের কথা বলেছেন। দুনিয়ার সকল ছোটোগল্পকেই এই তিন শ্রেনির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আজকাল লক্ষ করা যায়, ইম্প্রেশন-মুখ্য গল্পেরই সমাদর বেশি। এডগার এ্যালান পো-ও এই শ্রেণির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন।

মুকুল

নগেন্দ্রবালা দাসী

॥ ১ ॥

যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স এগার বৎসর; কিন্তু বয়স অল্প হইলেও, আমার শাশুড়ি না থাকায় বিবাহের এক বৎসর পর হইতেই আমাকে নিয়মিত রূপে স্বামীর ঘর করিতে হয়। শ্বশুর ও স্বামী ভিন্ন শ্বশুরালয়ে আমার অন্য কোনো অভিভাবক ছিলেন না।

বিবাহের পাঁচ ছয় বৎসর পরে একদিন রাত্রিতে আমি আমার আট মাসের ছোটো মেয়েটিকে কোলে লইয়া বসিয়া আছি, স্বামী সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছেন; বাহিরে ভয়ানক দুর্যোগ, যেমন ঝড় তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি এমন সময় বাহির হইতে শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "সুবোধ, একবার এদিকে এসো।" স্বামী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। আমি কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। একটা দ্বারের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলাম। বোধহয় আমার আসিবার পূর্বেই তাঁহাদের দুই-একটা কথা হইয়া গিয়াছিল। আমি একটা কথা শুনিলাম, কিন্তু হঠাৎ মর্ম বুঝিতে পারিলাম না; শ্বশুর মহাশয় বলিতেছিলেন, "এরকম বিপদে একজন কুলীন ব্রাহ্মণে পালটা ঘরের আর একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মান রক্ষা না করিলে আর কে করিবে।"

স্বামী। "আপনার আদেশ আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু বাবা—"

শ্বশুর মহাশয়। "তাহা জানি সুবোধ, কিন্তু বুঝিয়া দেখ আমার অন্য কোনো সন্তান নাই যে তাহাকে দিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব।"

অনেকক্ষণ কথা নীরব ছিল, সহসা তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আপনাদেরই আশ্রিত প্রতিপালিত আমি, এ বিপদে কোথায় দাঁড়াইব? আমার উপায় করুন, সুবোধবাবু!"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "কী বল সুবোধ? একমাত্র তোমার মতামতের উপর এই শুভকার্য নির্ভর করিতেছে।" স্বামী অনেকক্ষণ নির্বাক ছিলেন, অবশেষে বলিলেন, "কী আর বলিব? আপনার যেমন অভিরুচি; আপনার আদেশে আমি বলিদানে প্রস্তুত।" তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর—অতি ধীর।

"আমি বুঝিতেছি এ কাজটা খুব যুক্তিযুক্ত নয়, কিন্তু দুর্যোগের রাত্রিতে অন্য উপায় আর কী আছে? আজ ব্রাহ্মণের জাতি যায়!"—শ্বশুর মহাশয়ের কথা শেষে অপরিচিত ব্যক্তি অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমায় রক্ষা করুন সুবোধবাবু, এ বিপদে আমাকে উদ্ধার করুন।"

অতি মৃদুস্বরে আরও দুই চারিটা কথার পর সকলে নীরব হইলেন; পদশব্দে চমকিত হইয়া আমি ফিরিয়া দ্রুত পদে আমার দ্বিতলস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই স্বামী ফিরিয়া

আসিলেন, বিরস বদনে রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "আজ রাত্রে বাড়ি ফিরিব না।" আমি তাঁহার বসনাগ্র চাপিয়া ধরিলাম, "কোথায় যাও?"

স্বামী উত্তর করিলেন না, ক্ষুণ্ণভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। শেষে আমি আপনা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিয়ে করতে যাবে?"

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "না মরিতে।"

আমার বড়ো রাগ হইল; বলিলাম, "কেন বিয়ে করবে? তোমার ত স্ত্রী এখনও মরে নাই।" "বাবার আজ্ঞা।" এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইলাম। তাঁহার কথা শুনিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল; রাগ করিয়া বলিলাম, "বাবার আজ্ঞায় তুমি আবার বিয়ে করবে? কী পিতৃভক্তি!"—স্বামী কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রাগে দুঃখে অভিমানে আমার কণ্ঠ রোধ হইয়াছিল, তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য আমি কোনো চেষ্টা করিলাম না; কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল মরণ হইলে বাঁচিতাম। কিন্তু না মরিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম—'এমন মানুষ তো উপন্যাসের বাহিরে কোথাও দেখি নাই, বাবার এক কথাতেই আবার বিবাহ করিতে চলিলেন, আমি কেহ নহি।' শেষে কনের বাপের ওপর গিয়া সব রাগ পড়িল, বুড়ো আর কোথাও জায়গা পেলে না, মরতে এখানে এসেছিল! যদি মেয়ের বরই না মিলাতে পারবি, তবে গঙ্গার জলে মেয়েটাকে ফেলে দিলি না কেন?—বোধহয় শেষ রাত্রে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রত্যুষে যখন বুড়ি কাঁদিয়া উঠিল তখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, স্বামী বিবাহ করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন, নবাগতা বধূ আমাকে প্রণাম করিতেছে। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলাম, সেসব কিছুই নয়; বুড়িকে কোলে লইয়া শুইয়া আছি।

॥ ২ ॥

বিবাহ করিয়া স্বামী পরদিন বাড়ি ফিরিলেন, দেখিলাম নবাগতা বধূ বালিকা নহে, সে যুবতী। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সে মুখখানি অতি সুন্দর! আমি আমার দুঃখ ঢাকিয়া আবার তাহার মুখ দেখিলাম; কী সুন্দর! যেন সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক, তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে একটি সুন্দর সরল কমনীয় মাধুর্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই বিমুগ্ধ হইতে হয়, মুখখানি আবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু আমার প্রাণের বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; রাগে, যন্ত্রণায় আমি তাহার দিকে চাহিলাম না। সে আসিয়া আমায় প্রণাম করিল, তাহাকে আমি একটা কথাও বলিতে পারিলাম না। ঘরে গিয়া দেখিলাম স্বামী বসিয়া আছেন; আমাকে দেখিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, "তোমার বোধহয় খুব রাগ হয়েছে, না?" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, "তুমি ভালোবাসতে পারবে তো! কোন্ অপরাধে আমাকে পর করলে?" স্বামী সস্নেহে আমার অশ্রু মুছাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, তোমাকে পর করিব কেন? কিন্তু মুকুলকেও যত্ন করতে হবে।" আমি কোনো উত্তর করিতে পারিলাম না, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দূরে দাঁড়াইলাম। স্বামী বলিতে লাগিলেন, "মুকুলের কাল রাতেই বিয়ের লগ্ন স্থির হয়েছিল, কিন্তু ওই রকম ঝড় বৃষ্টিতে বর আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া মুকুলের বাবা আমাদের এখানে এসেছিলেন।" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "থাক, ও সব আমি জানি।" সে দিন এই পর্যন্ত হইয়া রহিল।

বিবাহের এক সপ্তাহ পরে মুকুল বাপের বাড়ি চলিয়া গেল, আর এক সপ্তাহ পরে শ্বশুর মহাশয় তাহাকে লইয়া আসিলেন। আমি বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলাম, "আমি এখানে থাকব না, বাপের বাড়ি পাঠাবে ত পাঠাও, নইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিব।" তিনি প্রথমে চমকিয়া

উঠিলেন, তারপরই সংযত স্বরে বলিলেন, "অমন করো ত আমি মরিব। দেখ, বন্দুকে গুলি ভরিয়া রাখিয়াছি, আবশ্যক বুঝিলেই এই গুলি খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

কী নিষ্ঠুর কথা! শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ও মরিবার বাসনা তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল। আমার বাপের বাড়ি যাওয়া হইল না; শেষে মুকুলের সহিত খুঁটিনাটি লইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, মুকুল আমার কাছে অকারণে তিরস্কৃত হইয়া একটাও উত্তর করে না; নতমুখে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়। একা আর কতই বকিয়া মরিব, তাহলে ত কার্য সিদ্ধ হইবে না। মুকুল ত ইহাতে বাড়ি ছাড়িবে না। অবশেষে একটা বুদ্ধি আঁটিলাম, কণ্টক যাহাতে সহজে উৎপাটিত হয় তাহার চেষ্টায় রহিলাম, একদিন সন্ধ্যার সময় মুকুলের ঘরে ঢুকিলাম, দেখিলাম মুকুল জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আমি ডাকিলাম, "মুকী!" মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত করিয়া মধুর কণ্ঠে মুকুল বলিল, "কেন দিদি?"

আমি বলিলাম, 'তোর সঙ্গে গোটা কত কথা আছে।'

'বল না দিদি, কী কথা!' মুকুল আমার হাত ধরিয়া শয্যায় বসাইল।

'আমার স্বামী তোমাকে বিবাহ করেছেন, কিন্তু তোমাকে ভালো বাসেন কী?'

মুকুল। 'কেন দিদি, একথা বলছ? তিনি ত খুব যত্ন করেন।'

আমি। 'না, তিনি তোমায় একটুও ভালোবাসেন না।'

মুকুল। 'তা; কী করবো? আমার বাবাকে তিনি যে বিপদ হতে উদ্ধার করেছেন, এই যথেষ্ট, ভালোবাসা না বাসা তাঁহার ইচ্ছা।'

সেকী! তুই এই অবস্থাতেই সুখী? আমার কথার উত্তর মুকুল নত মুখে বলিল, "হাঁ" আমি বুঝিলাম, এ বড়ো সহজ মেয়ে নয়! তাহার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলাম, "তোমাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে, তার কী?"

ভয়চকিত নেত্রে মুকুল আমার দিকে চাহিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "কেন দিদি?"

"আমার স্বামীতে আমার পুরো দখল, তুই রাক্ষসী, তার মাঝে কে?" বলিয়াই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মুকুল ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি। কী হয়েছে বল না।"

আমি বলিলাম, "তুই যত শীঘ্র হয় বাড়ি ছাড়িয়া যা, নহিলে আমি বড়ো অনর্থ ঘটাব, কিন্তু সাবধান, যদি এই সব কথা বাহিরে প্রকাশ পায়; তবে তোর অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।"

মুকুল বলিল, "স্বামীকেও জানাইব না দিদি?"

"স্বামী! তোর স্বামী কিসের?" আমার কথা শুনিয়া এবার মুকুল কাঁদিয়া ফেলিল। আমি সেখানে আর না দাঁড়াইয়া সে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলাম।

রাত্রিতে শ্বশুর মহাশয় আহারে বসিয়াছেন। মুকুল ও আমি সম্মুখে বসিয়া আছি, কিন্তু পরে মুকুল অতি বিনীতভাবে বলিল, "বাবা!"

শ্বশুর মহাশয় সস্নেহে কহিলেন, "কেন মা লক্ষ্মী!"

মুকুল একবার আমার দিকে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন কী?"

কিয়ৎকালের জন্য আহার স্থগিত রাখিয়া শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "কেন?"

মুকুল একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "অনেক দিন বাপের বাড়ি যাইনি, তাই বল্‌ছি।" শ্বশুর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব।" তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বড়ো বউমা! তোমার কী মত?"

আমি নতমস্তকে গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আপনার মতের উপর আর আমার কথা কী?"